CBCS B.A. HONS -POLITICAL SCIENCE

SEM-VI : CC-14T: Indian Political Thought-II
TOPIC: X - Nehru: Secularism
নেহেরু: ধর্মনিরপেক্ষতা

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

ভূমিকা:

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism)শব্দটির বিস্তৃত অর্থ রয়েছে।তবে ধর্মনিরপেক্ষবাদ বলতে সাধারণত রাষ্ট্র আর ধর্মকে পৃথকরূপে প্রকাশ করাকে বোঝায়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ধর্ম বা ধর্মীয় রীতিনীতির বাইরে থেকে পরিচালনা করাকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আইন কোন নির্দিষ্ট ধর্মের উপর নির্ভরশীল থাকেনা। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকেই পক্ষপাত করে না। এই মতবাদ অনুযায়ী, সরকার কোনরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোন ধর্মকে কোন প্রকার অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করবে না।কাউকে ধর্ম পালনে বাধ্য করা হবে না। সকল ধর্মের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো, তথ্য এবং প্রমাণের উপর নির্ভর করবে, কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নয়। অর্থাৎ বলা যায়, "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার"। রাজনৈতিক ব্যবহারের দিক থেকে বলা হয়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে পৃথক করার আন্দোলন, যাতে ধর্মভিত্তিক আইনের বদলে সাধারণ আইনজারি এবং সকল প্রকার ধর্মীয় ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ গড়ার আহ্বান জানানো হয়।

জওহরলাল নেহরুর কাছে ধর্মনিরপেক্ষতা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত প্রত্যয়ই ছিল না, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এবং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর রাষ্ট্রীয় নীতিও ছিল। নেহরু স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন, সবক্ষেত্রে পুরাকালে রচিত শাস্ত্রের কতগুলো অযৌক্তিক বদ্ধমূল ধারণার সনাতন সত্যতায় বিশ্বাস করতেন না। ভারতে ও সমগ্র পৃথিবীতে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। বিরাট একটি উৎপাদন তন্ত্র শুধু কতিপয়ের লোভে ও লাভের উদ্দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে আর সর্বসাধারণ কেবল সুষ্ঠু জীবনধারণের প্রয়োজনে তার সামান্য অংশও পাচ্ছেনা, ক্ষুধা ও অস্বাস্থ্যে ভুগছে, এই অর্থনৈতিক অব্যবস্থার প্রতিকারই প্রধান কর্তব্য বলে তাঁর মনে হয়েছে।

রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক বলেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করবে এটাই সহজ কথা - সাতচল্লিশে স্বাধীনতার পরে নয়, আসলে তারও অনেক আগে থেকে, জওহরলাল নেহরু এটাই ভেবেছিলেন। সংখ্যাগুরুর আধিপত্য সম্পর্কে, তার বিপদ সম্পর্কে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। ১৯৩৮ সালে এক মার্কিন পত্রিকায় নেহরু লিখেছিলেন, জাতীয়তাবাদ, অসহিষ্ণুতা ও নির্মম হিংসার জনক হয়ে উঠছে, যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল তাই জাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করে ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, জাতিবিদ্বেষ ইত্যাদি। তিনি সচেতন ছিলেন,

আধিপত্যকামী জাতীয়তাবাদ ভারতে সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় করতে পারে। তাঁর উন্নয়ন-চিন্তাও এই ভাবনার সঙ্গে সমঞ্জস ছিল। তিনি যে উন্নয়নের কথা ভাবতেন, উদার ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্র তার পক্ষে জরুরি ছিল। অন্তত তাঁর বিচারে। এই কারণেই রাষ্ট্রের অধিনায়কত্বে বিকাশ বা উন্নয়নের ভাবনাকে তিনি সে দিন সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের থেকে বেশি জরুরি বলে মনে করেছিলেন। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, আমি অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করছি আমি সমাজবাদী ও প্রজাতন্ত্রী, আমি রাজতন্ত্র বা আজকাল যে তন্ত্রে এমন সব শিল্পপতি তৈরি হচ্ছেন যাঁদের পরশ্রমে নিজেদের মেদপুষ্টির স্পৃহা ও ক্ষমতা আগের কালের অত্যাচারী রাজাদের চেয়েও বেশি, সেই তন্ত্রে আমি বিশ্বাসী নই।

তাই বলে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামত ঘোর অবিশ্বাসীর মত ছিলনা। তিনি তাঁর Discovery of India বইতে বলেছেন : ধর্ম অবশ্যই মানবমনের কোনো গূঢ় ও গভীর অভাববোধ পূরণ করে, বিজ্ঞান প্রকৃতির যত রহস্যই উন্মোচন করুক না কেন, আরও কিছু নিগুঢ়তর রহস্য থেকে যায় যা বিজ্ঞানেরও আওতার বাইরে॥ কিন্তু নেহরু সর্বদাই ধর্মসংগঠনের বিরুদ্ধে ছিলেন। এই সংগঠনগুলো শেষ পর্যন্ত কায়েমী স্বার্থে পরিণত হয়, সমাজের বৃহত্তর অংশের দুঃখ দুর্দশাকে ঈশ্বরের বিধান বলে প্রচার করে অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থের পরিপো ষকতা করে। সুতরাং ধর্মের যদি কোনো কাজ থাকে তবে তা শুধু ব্যক্তির নৈতিক ও আত্মিক উন্নতিসাধন, কিন্তু সংগঠিত আকারে সমাজের পরিবর্তন এবং সমাজবাদের প্রতিষ্ঠার সহায়ক নয়॥

ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে গ্রহণ করলে তার থেকে কতগুলো সিদ্ধান্ত আসে। প্রথমত, রাষ্ট্র কোনো একটি বিশেষ ধর্মের পরিপোষকতা করবে না। দ্বিতীয়ত, যে কেউ তার স্বীয় ধর্মীয় আচরণে কোনো বাধা পাবে না, সে-ও অপরের ধর্মীয় আচরণে কোনো বাধা দেবে না। তৃতীয়ত, সব ধর্মের লোকই নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার পাবে। মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চ রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করত, তাই সেই সময়ের ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ধর্মনিরপেক্ষ ছিল একথা নিশ্চই বলা চলে না। এখনও দেখা যায়, কোনো কোনো রাষ্ট্র একটি বিশেষ ধর্মীয় নাম গ্রহণ করে। তার ফলশ্রুতি দাঁড়ায়, ঐ ধর্মের প্রাচীন শাস্ত্রের বিধিনির্দেশগুলি ঐ রাষ্ট্রের আইন হয়ে দাঁড়ায় ; তার ফলে সেই রাষ্ট্রের অপর ধর্মাবলম্বী লোকেরা নাগরিকত্বের সমান সুযোগ সুবিধা পায় না। ফলে, ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে অসাম্য আসে। সমাজবাদের ভিত্তি সাম্য, ধর্মীয় রাষ্ট্র সামবিরোধী। নেহরুর সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় তা কার্যকর করতে দেখা গেছে। একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রনীতি হিসেবে গ্রহণ করলেই মধ্যযুগের ধর্মীয় বিরোধের হিংস্রতার পুনরাবৃত্তি নিবারণ করা যেতে পারে এমনটাই নেহরুর ভাবনা থেকে বলা যায়।

১৯৩৩ সালে তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বলেছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামকে দরিদ্র জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নতির সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। রাজনীতির কূট-কৌশলে

এবং ঘটনাচক্রে যখন ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারতভাগ অনিবার্য হয়ে উঠল, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট লাহোরে ও অমৃতসরে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে উঠল, এবং তার প্রতিক্রিয়া দিল্লীতে ছড়িয়ে পড়ল, তখন নেহরু সকল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারনাকে তুলে ধরে রাখলেন। তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লিখলেন, লাহোরে যা হচ্ছে এবং হয়েছে তার প্রতিক্রিয়ায় যদি আমরা অনুরূপ আচরণ যেন না করি।

নেহরুর কঠোর সমালোচক D.F.Karaka পর্যন্ত লিখলেন, ভারতবিভাগের পরমুহুর্তের সংকটকালে নেহরু একক হস্তে দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে সচেষ্ট ছিলেন, এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে দৃঢ় ছিলেন। ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে পূর্ববঙ্গের শরণার্থী আগমনের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকলে, এবং তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুরা ভীত হয়ে পড়লে, বৃটিশ কুট কৌশলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ নেহরু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন দুই প্রধানমন্ত্রী মিলে দুই বাংলায় ঘুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে, সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ রোধ করতে। লিয়াকত আলি যুগ্মভাবে বঙ্গভ্রমণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, নেহরুর পদত্যাগের পরিকল্পনায় আপাতত ইতি পড়ল।

প্রধানমন্ত্রী থেকে তার পরেও তিনি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তার পদত্যাগের ইচ্ছা জানান তিনি তাঁর ইঙ্গিত পন্থায় কাজ করতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত নেহরুর পদত্যাগের পরিকল্পনা কার্যকরী হল না এবং পরে লিয়াকত আলির সঙ্গে একটা চুক্তি হল, দুই সরকারই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকত্বের সব অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তবে এই সাময়িক শান্তিও বেশিদিন টিকল না। তবুও এই প্রসঙ্গে নেহরু ১৯৫৩ সালে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের লিখেছিলেন-আমার প্রধানমন্ত্রীত্বে তিনি কখনও সাম্প্রদায়িকতাকে রাষ্ট্রনীতির ওপর হস্তক্ষেপ করতে দেবেন না কারণ ঐ মনোভাব বর্বরতা ও অসভ্যতার সামিল।

যদিও পরবর্তী ইতিহাস স্বাভাবিক ভাবেই নেহরুর মডেল ও তার রূপায়ণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তার দার্শনিক ও মতাদর্শ ভিত্তিক অভিমত কে কেন্দ্র করেই। সময়ের সাথে সাথে মূল্যায়ন করা হয়েছে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁদের মতে, ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে প্রগতি, স্বাধীনতা এবং বৈজ্ঞানিক মানসিক বিকাশের অঙ্গ, এগুলি হলেই ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতাত্ত্বিকদের একটি অংশ মনে করেন, সেকুলারিজম-এর যে ধারণাটি প্রচলিত হয়েছে, তা পশ্চিম থেকে নেওয়া, এটি ভারতীয় মানসের সঙ্গে আসলে কোনও দিন সম্পৃক্ত হতে পারেনি। কারণ পশ্চিমে গির্জা ও রাষ্ট্র, ধর্ম ও রাজনীতি যে ভাবে পৃথক হতে পেরেছে সে ভাবে ভারতীয় সমাজে রাজনীতি ও ধর্ম পৃথক হতে পারেনি। ভারতের মত বিরাট দেশে সব ধর্মের লোকেদের মধ্যেই , বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের মধ্যে, সমনাগরিকত্বের অধিকারবোধ জাগ্রত করা দরকার। এটা ঠিক যে ভারতে ধর্মীয় বিরোধ আজও মিটে যায়নি, তবুও স্বীকার করতে হবে, বহু ঘাত-

প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েও ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের রাষ্ট্রনীতির একটি স্তম্ভ। এবং তাঁর জীবনাবসানের এত দশক পরেও এই স্তম্ভ এখনও দৃঢ়ভাবে দন্ডায়মান।